Vol. 52 | No. 3 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নারীর মাতৃরূপ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন সেন ও শওকত ওসমানের উপন্যাস

Volume	52
Issue	3
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	পারভীন আক্তার জেমী
Published online	June 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i3.4
Pages	69-85
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

নারীর মাতৃরূপ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন সেন ও শওকত ওসমানের উপন

Check for updates

পারভীন আক্তার জেমী*

নারীর সবচেয়ে আদর্শায়িত রূপ মা। সন্তানের জন্ম থেকে আশৈশব সমস্ত চাহিদা, চিন্তা বা সত্তা জুড়ে মায়ের পবিত্ররূপ বিরাজ করে। মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে মা বা জননীই সব। নারীর মাতৃসত্তা দেশ-কাল-ধর্ম নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রে একরূপে বিরাজমান। দেশের রূপকে মাকে কল্পনা করা হয়। মা বা জননী হয়ে উঠে সন্তান বা জাতিসত্তার রূপ। বাংলা সাহিত্যে মাকে নিয়ে খুব বেশি সাহিত্য রচিত হয়নি। বাংলা উপন্যাস ধারায় মাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে *জননী* (১৯৩৫) নামে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। পরবর্তীকালে শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) রচনা করেন *জননী* (১৯৫৭) এবং সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) রচনা করেন *মা* (১৯৭০) উপন্যাস। এই তিনটি উপন্যাসে নারীর মাতৃরূপ বিভিন্ন আঙ্গিকে বিকশিত। কখনো সন্তানের জননী, কখনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মা। তিনটি উপন্যাসে নারীর মাতৃরূপের স্বরূপ বিশ্লেষণ আমাদের আরাধ্য।

বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেকের রচনায় জননী চরিত্রের রূপায়ণ ঘটেছে। কিন্তু জননী প্রধান চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *জননী*তে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম রচিত উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫)। রচনাকালের দিক থেকে *জননী* মানিকের দ্বিতীয় উপন্যাস, প্রকাশকালের দিক থেকে প্রথম। শওকত ওসমানের *জননী*ও রচনাকালের দিক থেকে দ্বিতীয়, প্রকাশ কালের দিক থেকে প্রথম। শওকত ওসমানের রচিত প্রথম উপন্যাস *বনী আদম*। মানিক, শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস তিনটি যে কালের প্রেক্ষাপটে রচিত (রচনাকাল ও পটভূমির দিক থেকে) সে কাল অনেকটাই কাছাকাছি। সময়টা ছিল ত্রিশ-চল্লিশের দশক। প্রেক্ষাপটের কাল কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও তিন উপন্যাসিক আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে জননী বা মায়ের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। মানিক তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসগুলোতে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মানিকের উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-নির্ভরতায় বিভিন্ন চরিত্রের বিশ্লেষণ ধরা পড়ে। ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর রচিত উপন্যাসে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি মার্কস দ্বারা প্রভাবিত হন। শওকত ওসমানের "*জননী* উপন্যাসের কিছু অংশ সওগাত পত্রিকায় ১৯৪৪-৪৫ সালে ছাপা হয়। তখন উপন্যাসটির নাম ছিল *জিন্দান*। *জননী* উপন্যাসটি উর্দুতে *আম্মিজান* নামে অনূদিত হয়েছিল।" (কুদরত, ২০১৩ : ৬৫) শওকত ওসমানের *জননী*

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উপন্যাসটি রচনার সূত্রপাত ঘটে ১৯৪০ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। ১৯৪৭ সালের পর উপন্যাসটি লেখার কাজ শেষ হয়। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত *জননী*র মুখবন্ধে শওকত ওসমান বলেছেন — "১৯৪০ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। স্বাধীন স্বদেশে এর সমাপ্তি। কাহিনীর পটভূমি চল্লিশ বছর আগেকার।" (শওকত, ১৯৬১ : মুখবন্ধ) সত্যেন সেনের *মা* বিশুদ্ধ রাজনৈতিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে সত্যেন সেন মার্কসীয় রাজনৈতিক জীবনবোধকে তুলে এনেছেন। উপন্যাসে যে সময়কে ধারণ করা হয়েছে তার সীমা তিরিশের দশকের শেষার্ধ থেকে চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *জননী*তে শহরতলির যন্ত্রণাজর্জর মধ্যবিত্ত পরিবারের এক জননীর কাহিনি চিত্রিত করেছেন। যেখানে মানিক "নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠতা ও বিজ্ঞানমনস্কতায় জননী চরিত্রকে তার সকল কর্ম, চিন্তা ও বিশ্বাসের পটভূমিতে এবং সর্বোপরি তার মনোদৈহিক অবস্থানের আলোকে তুলে ধরেছেন।" (সরকার, ২০০৩ : ২৩৬) শওকত ওসমান *জননী*তে বাস্তববাদী জীবনদৃষ্টিতে এক দারিদ্র্যক্লিষ্ট জননীর সংগ্রামকে উপস্থাপন করেছেন। বাঙালি মুসলমানের জীবন সংগ্রামের বাস্তবতাকে প্রথম এ উপন্যাসে তুলে ধরা হয়। এ দিক থেকে উপন্যাসটি বাঙালি মুসলমানের প্রথম বাস্তববাদী উপন্যাস। ১৯৩৩ সালে কাজী ইমদাদুল হক তাঁর *আবদুল্লাহ* উপন্যাসে মুসলমান সমাজের পারিবারিক ও গোত্রীয় সীমাবদ্ধতাকে রূপদান করেন। *জননী* মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিভাবকের দায়িত্ব না নিলেও মুসলিম পরিবারের মূল্যবোধের চিত্র তুলে ধরেছে। আর সত্যেন সেন চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসের পালাবদল বা রূপান্তরের সত্যকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। সেখানে মা-রূপী অসীমা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন সেন ও শওকত ওসমানের উপন্যাসে মা-রূপদানকারী তিন চরিত্র শ্যামা, অসীমা ও দরিয়া বিবি। তিনজন ঔপন্যাসিকই এই তিন চরিত্রের জীবন সংগ্রাম ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাদের মাতৃত্বের স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্যামা ও দরিয়াবিবির চরিত্রটি উপন্যাসের শুরু থেকেই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জীবন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। যেখানে শ্যামা ও দরিয়া মাতৃত্বের মহিমায় নিজ সন্তানের জন্য দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছে। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। অসীমাও লড়াই করেছে। তবে তার মাতৃস্বরূপের চিন্তা, চেতনা ও উদ্দেশ্য ভিন্ন আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে। সন্তানের জন্য মায়ের সংগ্রাম তাদের চরিত্রের গভীরেই প্রোথিত। শ্যামা, দরিয়াবিবি ও অসীমার চরিত্র বিশ্লেষণেই ধরা পড়ে তাদের মাতৃত্বের রূপ, সন্তানের জন্য নারীর মহিমান্বিত রূপের ফল্গুধারা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জননী* উপন্যাসের মাতৃরূপী শ্যামা চরিত্র বিশ্লেষণে দেখতে পাই, এগারো বছর বয়সে মাতৃহীন, আত্মীয়-স্বজনহীন শীতলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্যামা সাত বছরের বধূ জীবনে সন্তানের আশা যখন ছেড়ে দিয়েছিল তখন বাইশ বছর বয়সে প্রথমবার মা হবার গৌরব অর্জন করে। তখন একাকী, নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের কষ্ট, মা-বাবা না থাকার কষ্ট শ্যামার চেয়ে আর কেউ হয়তো বেশি উপলব্ধি করতে পারেনি। শ্যামা মাতৃত্বের অনুভূতি প্রথম যখন টের পেল তখন শ্যামা ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। ভয়ানক অসুখ হলে লোকের যে রকম অনুভূতি হয় শ্যামার প্রথমে সে রকম অনুভূতি ছিল। লেখকের ভাষায়

— "কড়া শীতের সঙ্গে শ্যামার অজ্ঞাতে যাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সে জন্ম লইল শরৎকালে। জগজ্জননী শ্যামা জগতে আসিয়া মানবী শ্যামাকে একেবারে সাতদিনের পুরাতন জননী হিসাবে দেখিলেন।" (মানিক, ১৯৯৫ : ৭)

সন্তান জন্ম দিয়ে শ্যামা যেন যন্ত্রণাজর্জর জীবন থেকে মহামুক্তি লাভ করল। প্রথম সন্তানের মুখ দর্শন শ্যামাকে ভুলিয়ে দিল সমস্ত যন্ত্রণা। সে মুক্তির উল্লাস শ্যামা বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে পারল না। শ্যামার অতিরিক্ত যত্ন ও সচেতনতা সত্ত্বেও প্রথম সন্তানকে বারো দিনের বেশি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। প্রথম সন্তানকে নিয়ে শ্যামার ভেতর অপারগতার অপরাধবোধ ছিল। তাই অতিরিক্ত ভয়, সচেতনতা তাকে ঘিরে ছিল। ভেবেছিল " জননীর সমস্ত কর্তব্য সে তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলিবে।" (মানিক, ১৯৯৫ : ১৪) কিন্তু তা মিথ্যা প্রমাণ করে শ্যামার প্রথম সন্তান শ্যামাকে ফেলে চলে গেল। দু বছরের মধ্যে শ্যামা আবার দ্বিতীয় সন্তানের মা হল। "কিন্তু মানুষের জীবনে অভাবের পূরণ আছে ক্ষতির পূরণ নাই বলিয়া প্রথম সন্তানকে শ্যামা ভুলিতে পারে নাই।" (মানিক, ১৯৯৫ : ১৭) তাই দ্বিতীয় সন্তানের জন্মগ্রহণে শ্যামার মধ্যে কোনো অসংযত উল্লাস কাজ করেনি। মনে হয়েছিল চির পরিচিত স্বাভাবিক নিয়মের এটিও একটি। "এতে না আছে বিস্ময়, না আছে উন্মত্ততা।" (মানিক, ১৯৯৫ : ১৭) অবচেতন মনে শ্যামা লালন করে ভয়, ভীতি ও যন্ত্রণা। "ফলে সামগ্রিক সুস্থতার আড়ালে শ্যামা সংগোপনে লালন করে এক রোগ-জর্জর জীবন।" (সরকার, ২০০৩ : ২৩৭)

তাই দ্বিতীয় সন্তান জন্মদানের পর সন্তানের বাঁচার প্রত্যাশা শ্যামাও করে। শ্যামার ভেতর জেগে ওঠে মাতৃত্ব। শ্যামা অবচেতন মনের ভাবনায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ভাবে যে পৃথিবীর সবার সন্তানই যদি মরে যায় তাহলে পৃথিবী মানুষশূন্য হয়ে পড়বে। তাছাড়া সংসারে অনেক নারী আছে যাদের সন্তান বাঁচে না। আবার কারো দশ-বারোটি সন্তান বেঁচে থাকার পরও পরেরটি বেঁচে থাকে না। দ্যোদুল্যমান চিন্তায় শ্যামা গ্রহণ করে মাদুলি। অন্তরে থাকে সুপ্ত বিশ্বাস। ভাবে, "মানুষের আশা এমন ভঙ্গুর নয় যে একবার ঘা খাইলে চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে।" (মানিক, ১৯৯৫ : ১৮) তাই শ্যামা সন্তানের আশ্চর্য কাণ্ডগুলোতেও নিজের উচ্ছ্বাসকে অসংযত হতে দেয়নি। মনের মধ্যে সর্বদা শঙ্কা, ভয় জেগে থাকে। শ্যামা ভাবে যে, ভগবান মানুষকে আনন্দের একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা লঙ্ঘন করা উচিত নয়। ক্রমে ক্রমে শ্যামা তিন সন্তানের জননী হয়ে ওঠে। বিধানচন্দ্র, বকুলমালা ও বিমান বিহারী। তিন সন্তানের জননী শ্যামা সময়ের সাথে সাথে হয়ে উঠে পুরোপুরি গৃহকর্ত্রী। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় সংসারের আর্থিক দায়িত্ব পুরুষের উপর থাকলেও এ ক্ষেত্রে শীতলের অর্থোপার্জন সত্ত্বেও কর্তৃত্ব চলে যায় শ্যামার হাতে। শীতলের প্রতি শ্যামা যৎসামান্য দায়বোধ অনুভব করে। তার সমস্ত সত্তা জুড়ে থাকে জননীর স্বরূপ। আসলে সাত বৎসরের বন্ধ্যা জীবন-যাপনের পর লাঞ্ছিতা পত্নী যখন জননী হয়, তখন কেবা কবে তাকে ফিরে পেয়েছে! মাতৃত্বের মহিমা ছাড়া তাকে আর কোনো রূপে ফিরে পাওয়া দুষ্কর। মাতৃত্বই শ্যামাকে তার অস্তিত্ব রক্ষায় সচেতন করে তোলে। মাতৃত্বের প্রথম উপলব্ধিতে যে ভয়কে প্রথমে শ্যামা লালন করেছিল, মায়ের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন তাকে তার সে ভয়কে অতিক্রম করতে সাহায্য করে। সন্তানের কারণেই শ্যামা হয়ে উঠে নির্ভীক।

> সন্তান ধারণের পূর্ব পর্যন্ত যে শ্যামা স্বামীর পীড়নে ছিল সর্বদা ভয় কাতর, সন্তানের জন্মের পর সেই শ্যামাই হয়ে ওঠে নির্ভীক। নতুন পরিস্থিতিতে স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা বা অবহেলা প্রদর্শনের কিংবা শুভাশুভ সম্পর্কে স্বামীকে নির্দেশ দানের সাহসও সে সঞ্চয় করে। মাতৃত্বের এই শক্তিই তাকে পরবর্তীকালে সংসারের সর্বময় কর্ত্রীত্বে রূপান্তরিত করে। (সৈয়দ, ২০০৬ : ৫৪-৫৫)

চাঞ্চল্যহীন বিধান সব সময় শ্যামার চিন্তায় ভর করে। ছেলেকে লেখা-পড়া শিখিয়ে বড় করতে চায় সে। শচী মাতার মতোই শ্যামার মনে বিধানের জন্য ব্যাকুলতা জাগে। সন্তান যেন একচেটিয়া শ্যামার। বিধানের সাথে শ্যামার সম্পর্ক নিয়ে এক ধরনের ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করে শীতল। কিন্তু শ্যামা থেমে নেই। শীতলের উপার্জিত আয় ও নিজের কায়িক শ্রমে সংসারের যাবতীয় খরচের পর সে তিল তিল করে অর্থ সঞ্চয় করে। আবার ঋণগ্রস্ত স্বামীর হাতে জমানো অর্থ তুলে দিতেও কার্পণ্য করেনি শ্যামা। এমনকি স্বামীর একান্ত সান্নিধ্যের মুহূর্তেও শ্যামার সমস্ত সত্তা জুড়ে জননীর স্বরূপ বিরাজমান থাকে। শ্যামা জানে শীতলের উপর নির্ভরশীলতায় অনিশ্চয়তা আছে। শ্যামা সন্তানের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকে। কীভাবে তাদের মঙ্গল হবে, তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে এটাই সার্বক্ষণিক চিন্তা। সংসারী, কর্মঠ শ্যামা দিন-রাত সেই চিন্তায় বিভোর থাকে। সন্তানের জন্য শ্যামা নিজের আত্মসম্মানকেও উপেক্ষা করে। স্কুলে যাতায়াতের জন্য বিধানকে শঙ্করের সাথে যেতে দেয়। বিধানের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ ও বুদ্ধিমত্তা শ্যামাকে বড় হবার স্বপ্ন দেখায়। ছেলের জন্য যতটুকু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা যায় শ্যামা তাই করেছে। ক্রমে শ্যামা চতুর্থ সন্তানেরও মা হয়। অর্থ চিন্তায় সাংসারিক শ্যামাকে সর্বদা মগ্ন থাকতে হয়। শ্যামার জীবনে নির্ভরতার জায়গা খুব কম। খুব অল্প বয়সে বিবাহিত জীবনের শুরুতে স্বামীর বাড়িতে ননদের স্বামী রাখালের উপর নির্ভরতা জন্মেছিল। পরবর্তীকালে মামার উপর। দুজনের কেউই তার সে বিশ্বাস রাখতে পারেনি। তারপরও শ্যামা হাল ছাড়েনি। জননীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরলসভাবে করে গেছে। আর মনের ভেতর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে সন্তানের উপর শুধু শ্যামারই অধিকার। হিসেবে একটুখানি ভুল হয় শ্যামার। এক সময় বকুল ও শীতলের সম্পর্ক শ্যামার মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তোলে। শ্যামাকে শাস্তি দেবার জন্য শীতল বকুলকে নিয়ে পালিয়ে যায়। শ্যামা মাতৃত্বের পরাজয় অনুভব করে। "কে জানিত পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চারটি সন্তানের জননী শ্যামার জীবনে এমন নাটকীয় ব্যাপার ঘটিবে?" (মানিক, ১৯৯৫ : ৫৯)

মামাকে বিশ্বাস করে টাকা জমা রাখে। এক সময় মামা জানায় টাকা সব শেষ হয়ে গেছে। টাকা চুরির দায়ে শীতলের জেল হয়। সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে শ্যামার উপর। উদ্ভ্রান্ত চিন্তায় শ্যামার মন আচ্ছন্ন থাকে। শ্যামার যে কোন এক সময় যৌবন ছিল, শ্যামা চারটি সন্তানের জননী হয়ে উঠেছিল তা শ্যামার কাছে আজ বিস্মৃত এক অধ্যায়। জীবনে তারও যে স্নেহ মমতার প্রয়োজন, নির্ভরতার প্রয়োজন কে ভাবে? শ্যামারও নিজের সম্পর্কে ভাবার উপায় ছিলনা। শুধু জননীর কর্তব্য তাকে সম্মুখে ধাবিত করেছে। মনের মধ্যে বিদ্বেষ জেগে ওঠে। নিজের জীবনের এ অসহায়ত্ব শ্যামাকে কিছু সময়ের জন্য দ্বিধায় ফেলে দেয়। শ্যামার ক্ষত-বিক্ষত মনে সন্তানেরা শত্রু হয়ে ধরা দেয়। যে মা সন্তানের জন্য

অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে, আজ সে মায়ের স্বরূপে দেখা দিয়েছে বিদ্বেষ। জননী শ্যামাকে অতিক্রম করে অল্প সময়ের জন্য ব্যক্তি শ্যামা জেগে উঠে। শ্যামার মনোকথন :

> জননীর জীবন কেমন যেন নীরস অর্থহীন মনে হইত শ্যামার কাছে। কোথায় ছিল এ চারিটি জীব, কি সম্পর্ক ওদের সঙ্গে তাহার, অসহায়া স্ত্রীলোক সে, মেরুদণ্ড বাঁকানো এ ভার তার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে কেন? কিসের এই অন্ধ মায়া ? ...জগৎ জননী মহামায়া কিসের ধাঁধায় ফেলিয়া তাহাকে দিয়া এত দুঃখ বরণ করাইতেছেন? সুখ কাকে বলে একদিনের জন্য সে তাহা জানিতে পারিল না, তাহার একটা প্রাণ নিংড়াইয়া চারটি প্রাণীকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; — কেন? কি লাভ তাহার? চোখ বুজিয়া সে যদি আজ কোথাও চলিয়া যাইতে পারিত!...পেটের সন্তানগুলির প্রতি শ্যামা যেন বিদ্বেষ অনুভব করিত, — সব তাহার শত্রু, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ! (মানিক, ১৯৯৫: ৮৮-৮৯)

শীতল জেলে যাবার পর শ্যামা নিজ বাড়ি ভাড়া দিয়ে রাখালের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সন্তানের চিন্তা সারাক্ষণ তাকে চিন্তিত রাখে। সন্তানের জন্য শ্যামা খাবার পর্যন্ত চুরি করে। "এই শ্যামাই মন্দার সংসারে অস্তিত্ব রক্ষা এবং অভীপ্সা পূরণের প্রয়োজনে অমানুষিক পরিশ্রম করে, এমনকি সন্তানের জন্য চৌর্যবৃত্তিতে পর্যন্ত লিপ্ত হয়।" (সিদ্দিকা, ২০০৮ : ২০৭) এরকম অসহায় মুহূর্তে হারান ডাক্তারের স্নেহ ও অনুকম্পা শ্যামার জীবনে অমৃতের ভাণ্ডার নিয়ে এল। পিতার স্নেহ শ্যামা পায়নি। হারান ডাক্তারের স্নেহে শ্যামার ভেতরে সেই ভালোবাসার ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। কালুর বৌও অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারিয়েছিল। যেখানেই শ্যামা মাতৃহৃদয়ের অভাব অনুভব করেছে সেখানেই তার জননীরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যখন জানতে পারল বকুল মা হবে, শ্যামার জননীরূপ আবার ফিরে এল। রোগাক্রান্ত বকুলকে আদর-যত্নে-ভালবাসায় সুস্থ করে তুলল। বকুলের ঘরে এক কন্যা সন্তান জন্ম নিল। বকুলের পাশাপাশি নিজেও জন্ম দিল এক অন্ধ মেয়ের। বকুলের মেয়ের চোখ বকুলের মতোই সুন্দর হয়েছে। অথচ শ্যামার মেয়ে জন্মান্ধ। শ্যামার মনে খুব সামান্য সময়ের জন্য মাতৃত্বের ঈর্ষা প্রকাশ পায়। "সুলোচনা দৌহিত্রীর সঙ্গে নিজের জন্মান্ধ কন্যার তুলনা করে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ শ্যামা তার জননী সত্তাকেই পূর্ণতা দিয়েছে।" (সিদ্দিকা, ২০০৮ : ২০৭) কিন্তু তা খুব সামান্য সময়ের জন্য। অন্ধ মেয়ের যত্ন ও অসুস্থ শীতলের যত্নে শ্যামার মধ্যে নারীর শাশ্বত মাতৃসত্তার রূপটি প্রকাশিত হয়। "শ্যামা-চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানিক এ উপন্যাসে মাতৃত্বের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। মাতৃত্ব নারীজীবনের যে এক অসাধারণ শক্তি ও প্রেরণার উৎস, মানিক তা বিচিত্রভাবে পাঠকের কাছে বোধগম্য করেছেন।" (সৈয়দ, ২০০৬ : ৫৪) বিধানের বিবাহের পর শ্যামা পুত্রবধূর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। শ্যামা ভেতরে ভেতরে পরাজয়ের জ্বালা অনুভব করে। কিন্তু সুবর্ণের মা হবার সংবাদে শ্যামা ভুলে গেল ক্ষুদ্র বিদ্বেষ, আর তুচ্ছ শত্রুতা। সুবর্ণকে শ্যামা বুকে টেনে নিল। মাতৃত্বের মহিমা নিয়ে শ্যামা সুবর্ণের মা হবার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

> সুবর্ণের জীবন লইয়া শ্যামা যেন বাঁচিয়া রহিল। তারপর এক চৈত্র নিশায় এ বাড়ির যে ঘরে শ্যামা একদিন বিধানকে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে সুবর্ণ অচৈতন্য হইয়া গেল, ঘরে রহিল কাঠ কয়লা পুড়িবার গন্ধ, দেয়ালে রহিল শায়িত মানুষের ছায়া, জানালার অল্প একটু ফাঁক দিয়া আকাশের কয়েকটা তারা দেখা গেল আর শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন। (মানিক, ১৯৯৫: ১৪৩)

শ্যামার এ আনন্দের নিভৃতে ছিল তারই জননী হয়ে ওঠার গোপন ব্যাথা ও অনুভূতি। শ্যামার জীবনে প্রথম সন্তান জন্মের সময়টি অক্ষয় হয়ে ছিল। প্রথম মা হবার সময় যে অসহায়ত্ব, একাকিত্ব শ্যামা অনুভব করেছিল, নিজ সন্তানকে বাঁচাতে না পারার যে কষ্ট এতকাল বুকে লালন করেছিল সুবর্ণের প্রথম মা হওয়ার সময় শ্যামার যে অসহায় জননীরূপ, গোপন ব্যথার অনুভূতি ছিল, সুবর্ণের মাঝে শ্যামা সে অসহায়ত্বের রূপ দেখতে চায়নি। জননী শ্যামা তার সমস্ত মাতৃসত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়। মা হওয়ার আনন্দ, গৌরব এবং নিরাপত্তা দিতে চায় সুবর্ণকে। একজন নারীর মাতৃরূপের এমন বাস্তব চিত্র মানিক তাঁর উপন্যাসে দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। "বাইরের ঘটনা বৈচিত্র্যকে একান্ত গৌণ করে, অন্তর্জীবনের বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা মানিকের উপন্যাসে এই প্রথম।" (গোপিকানাথ, ২০০৮: ৩০)

শ্যামার মাতৃরূপ ছাড়াও মানিকের *জননী*তে আরো কিছু নারীর মাতৃত্বের স্বরূপকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি। এরা হলো, মন্দা ও বিষ্ণুপ্রিয়া। একজন অর্থের জলুসে অহংকারী, আরেকজন সন্তান জন্ম দিয়েও মায়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত। মন্দা তার দুই সন্তান নিয়ে পালিয়ে এসেছিল শাশুড়ির কাছ থেকে। শ্যামার বাড়িতে সন্তানদের সাথে সময় অতিবাহিত করে সন্তানকে বুঝাতে চায় মন্দা তাদের জননী। নিজ সন্তানের কাছে নিজেকে মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার মতো অপমান, অসহায়ত্ব, বেদনা একজন নারীর জন্য আর কী হতে পারে! নারীর কত বিচিত্র মাতৃরূপ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের স্বাভাবিক জীবনে নারীর অবস্থান, নারীর মনোবাস্তবতাকে সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। সন্তানের জন্য মায়ের ভালোবাসা, তাদের মঙ্গলের জন্য প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে টিকে থাকা, জীবন সংগ্রামে হেরে না গিয়ে বাস্তবতাকে মোকাবেলা করে সন্তানদের টিকিয়ে রাখার চিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষতার সাথে এঁকেছেন *জননী* উপন্যাসে।

> এই উপন্যাসে কোন ভাবালুতা নেই, প্রচলিত রোমান্স নেই, আছে চিরাচরিত সুখ-দুঃখময় বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক জননীর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের বাস্তব চিত্রণ। দৈনন্দিন জীবনের বিস্তৃত বর্ণনায়, বাস্তব পরিবেশ রচনায় শ্যামার কাহিনি অত্যন্ত স্বাভাবিকতা লাভ করেছে। এই কাহিনি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আপন কাহিনি হয়ে উঠেছে। সাধারণ বাঙালি সংসারে আমরা এই জননীকেই দেখি। এই চরিত্র রূপায়ণে মানিকের দক্ষতা এবং বাস্তবতা বিস্ময়কর। (সরোজমোহন, ২০০৯ : ২৩৭)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জননী* ও শওকত ওসমানের *জননী* একই নামে দুই উপন্যাস হলেও ঔপন্যাসিক হিন্দু ও মুসলিম দুই পরিবারের দুই মায়ের মাতৃত্বের রূপকে চিত্রিত করেছেন। শওকত ওসমানের উপন্যাসে জননী রূপে দরিয়া বিবির যে পরিচয় শুরুতে পাই তা হলো, মহেশডাঙার মামুলি চাষি আলী আজহার খাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে। এটি ছিল দরিয়া বিবিরও দ্বিতীয় সংসার। আজহার খাঁ মামুলি চাষি হলেও তার পূর্ব পুরুষদের ছিল গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। প্রায় একশ বছর আগে তার পূর্ব পুরুষেরা এদেশে এসেছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজেদের সঙ্গে। ঘটনা, পরিবেশ ও মানবতার কারণে বাঙালির কন্যাকে বিয়ে করে বাঙালি হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজেদের সাথে সংগ্রাম করে শহিদ হন। এই বংশের আলী আজহার খাঁর স্ত্রী জননীরূপী দরিয়া বিবির শারীরিক

গঠনের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবে — "তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। দোহারা বাঁধন শরীরের। গোলগাল মুখটি গাম্ভীর্যে টইটুম্বুর।" (শওকত, ১৪০৫ : ১৭) আজহার খাঁ ও দরিয়া বিবির দুই সন্তান নঈমাকে নিয়ে তাদের অভাবের সংসার। মামুলি চাষির সংসারে অভাব নিত্য সঙ্গী হলেও কর্মঠ দরিয়া বিবি সে অভাবকে ছাপিয়ে উঠতে দেয়নি। স্বামী আজহার প্রায়ই যাযাবর স্বভাবের কারণে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। যদিও সে স্বপ্ন দেখে সচ্ছলতার। আজহারের স্বপ্নে সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে বন্ধু চন্দ্র কোটাল। চন্দ্র কোটালের সাথে বন্ধুত্বের নেপথ্যে গ্রামে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির দিকটি ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের রোষে সে সম্প্রীতিতে কখনো কখনো ফাটল ধরে। তারপর আবার তারা সুখে-দুঃখে পাশাপাশি অবস্থান করে। প্রায়ই নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণে দরিয়া বিবির সংসারে নেমে আসে অমানিশা। দারিদ্র্যের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয় তাকে। দুটি সন্তানকে খেয়ে পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এসে পড়ে দরিয়া বিবির কাঁধে। আজহারও সংসারে সচ্ছলতা আনার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টার বাস্তব কোনো ফল দরিয়া বিবি উপভোগ করতে পারেনি। আজহার ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিল। তাই আজহারের নিরুদ্দেশ গমনের সময়টুকুতে ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে বাইরে উপার্জনের পথে পা বাড়ায়নি দরিয়া বিবি। কারণ মুসলমান নারীর খোলামেলা চলাফেরা আজহার পছন্দ করবে না। "পর্দানশীন নারীর মাঠে যাওয়া সাজে না।" (শওকত, ১৪০৫ : ২৮) দুঃসময়েও তাই দরিয়া বিবি মাঠের ফসলের ব্যবস্থা নিজে করতে পারেনি। দ্বারস্থ হতে হয়েছিল কোটালের। কিংবা আজহার যখন ফসলের মাঠে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বাগদি রমণীদের মতো দরিয়া বিবি আজহারকে তখনও কোনো সাহায্য করতে পারে না। 'মুমিনের ঘরের মেয়ে এতটুকু বেপর্দা হইতে পারে না।' (শওকত, ১৪০৫ : ২৯) ফলে দরিয়া বিবি বহির্জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। জীবন-যাপন, সংগ্রাম, পরিশ্রম নিয়ে শুধুমাত্র সংসারের গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে সে। তাই জীবনে একে একে নেমে আসে তার দুর্বিষহ সময়। দরিয়া বিবির আর্থিক দুরবস্থা থাকলেও তার ছিল আত্মসম্মান। নিজেকে সব সময় মনে মনে নির্বাসিত রাজনন্দিনীর সাথে তুলনা করেছে। কিন্তু তারই ঘরে আশ্রিত আসেকজানের করুণ, ভয়াবহ, দারিদ্র্যের বাস্তবরূপ দেখে দরিয়া বিবি আসেকজানের প্রতীকে নিজের বাস্তবতা অনুভব করে। বেড়ে যায় পোড়া মনে ক্ষতের জ্বালা। দুচোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুর প্লাবন। দারিদ্র্যের রূপকে লেখক প্রতীকায়িত করেছেন এভাবে — "দারিদ্র্যের নারী-প্রতীক যেন ওই গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছে। আল্লার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জীবন। এই তার পরিণতি! দরিয়া বিবি অসোয়াস্তি অনুভব করে। দারিদ্র্যের দাবানলে সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ জীবনের সমগ্র ঐশ্বর্য সম্পদ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।" (শওকত, ১৪০৫ : ৪৮)

এই কষ্ট-ক্লিন্ন জীবনে মনের গহীনে এক কোণে লুকিয়ে ছিল অতৃপ্ত এক মাতৃহৃদয়। আমজাদ ও নঈমাকে নিয়ে মাতৃত্বের স্বাদ পূর্ণ হলেও জীবনের প্রথম মা হওয়ার গৌরব এবং সন্তানের প্রতি মমতাকে দরিয়া বিবি কিছুতেই ভুলতে পারেনি। কর্মব্যস্ত জীবনেও প্রথম সন্তানকে কাছে না পাবার কষ্ট দরিয়া বিবিকে তাড়িয়ে বেড়ায়। যে সন্তানকে শহরে রেখে লেখাপড়া করানোর স্বপ্ন দেখেছিল সে মোনাদিরকে কাছে রাখতে না পারার কষ্ট তার

মাতৃহৃদয়কে ভেতরে ভেতরে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। প্রথম স্বামীর মৃত্যুতে দরিয়া বিবি অসহায় অবস্থায় পড়ে। পিতার আগে পুত্রের মৃত্যু হলে সম্পত্তি বণ্টন আইনে তার পরিবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। বঞ্চিতা দরিয়া বিবি অসহায় অবস্থার শিকার হয়ে দেবরদের সংসারে ফেলে আসে মোনাদিরকে। ফলে নঈমা, আমজাদকে কাছে পেয়েও দরিয়া বিবির মাতৃত্বের স্বাদ অপূর্ণ থেকে যায়। তার উপর সংসারের এত যন্ত্রণা। কিভাবে সংসারে একটু সচ্ছলতা আসবে এই চিন্তায় অস্থির থাকে সে। ছাগল ছানার মৃত্যু তার মনে হতাশা জাগায়। নঈমার কাপড় হারিয়ে গেলে দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জননী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। বেদম প্রহার করে নঈমাকে। যতটা না ক্ষোভ তার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা তাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে। অভাবের তাড়নায়, দুটি শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেয়ার চিন্তায় প্রবল বর্ষায় আমজাদকে প্রেরণ করে বাগদি শৈরমীর কাছে, ঘড়াটা বন্ধক রেখে পাঁচটি টাকা পাওয়ার আশায়। সন্তানের না খাওয়ার কষ্ট কী শুধু একজন মা-ই তা উপলব্ধি করতে পারে। ক্ষুধার্ত জঠরে "নিদ্রিত আমজাদের দিকে চাহিয়া দরিয়া বিবির বুকে শত তরঙ্গের আলোড়ন চলিতেছিল। বাহিরে তার প্রকাশ নাই।" (শওকত, ১৪০৫ : ৭৬) শৈরমীও দরিয়া বিবির কষ্ট উপলব্ধি করে। মনে মনে ভাবে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয় বলেই ঘরের লক্ষ্মী পরের কাছে রাখতে হচ্ছে। দুটি শিশু সন্তান নিয়ে দরিয়া অকূল সাগরে ভাসতে থাকে। যে সন্তানকে লেখাপড়া করানোর স্বপ্ন ছিল, আজ ক্ষুধার তাড়নায় সেই আমজাদকে কোটালের সঙ্গে জীবিকার অন্বেষণে, কাজ শেখার জন্য লগি হাতে নৌকায় প্রেরণ করে। এই তো জীবনের বাস্তবতা। অভাব ছিনিয়ে নেয় স্বপ্ন, সুখ, কল্পনা। তবুও বেঁচে থাকার প্রেরণা জেগে থাকে। জীবিকার অন্বেষণে আজহার ছুটে ফেরে কখনো রাজমিস্ত্রির কাজে, কখনো দোকানে পসরা বিছিয়ে। ভাগ্য হাতছানি দেয় না। যে তিমিরে সে তিমিরে রয়ে যায় আজহার। এত প্রচেষ্টার কোনোটাই ভাগ্যের লাগাম পায় না। ভরসা রাখে আল্লাহর উপর। বিশ্বাস থাকে — "ঈমানদার লোকের দিন আটকাইয়া থাকে না, আজহার এই মূল মন্ত্রটি সহজে বিস্মৃত হইত না।" (শওকত, ১৪০৫ : ৯৫) এমন সময়ে দরিয়াবিবি আবার গর্ভধারণ করে। গর্ভধারণ অবস্থায় সংসারে তার অমানুষিক কষ্ট করতে হয়। শুধুমাত্র সংসারের দায়ভারের জন্যই তাকে এই অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তার মা হতে তখনো চার মাস বাকি। তবু পরিশ্রমের কামাই নাই। তার উপর রয়েছে নঈমার চিন্তা। নঈমার চোখের পিচুটি ভাল হচ্ছেনা। পিচুটি ভালো না হলে নঈমার মতো গরিবের মেয়ের বিয়েই হবে না। আমজাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার নাই কোন বন্দোবস্ত। শ্যামার মনোকথনের সাথে দরিয়া বিবির মনোকথনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। লেখক দরিয়াবিবির অক্লান্ত, কষ্টসহিষ্ণু পরিশ্রমের চিত্র এঁকেছেন এভাবে —

> হঠাৎ ফিক ব্যথা ধরিয়াছিল দরিয়াবিবির জঠরে। চুলার আগুনে তার পাষাণ-স্তব্ধ মুখটি আরো কালো হইয়া গেল। পেটের কাপড় খুলিয়া চুলার উত্তাপ লাগাইতে বড় হইল দরিয়াবিবি। আরো জাকিয়া আসে ব্যথা। এখনও দু-হাঁড়ি ধান সিদ্ধ করিতে হইবে। ...অসহ্য বেদনায় তার পা কাঁপিতে থাকে। একবার শব্দ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিশ্চল পড়িয়া রহিল উলঙ্গ ইভের প্রতীক বহনকারী ভূলুণ্ঠিতা জননী।... এমন কর্মোন্মত্ত কেন দরিয়াবিবি? ... জগদ্দল প্রস্তর-শিলার বুকে প্রস্রবণের বুদ্বুদ উপল-রেখায় মৃদু তরঙ্গে সমাহিতি চায়। (শওকত, ১৪০৫ : ১০৫)

ভাবনায় বিস্মৃতিতে দরিয়া বিবির চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। এমন মানসিক অবস্থায় দরিয়া বিবি তার গৃহকোণে আবিষ্কার করল দশ-বার বছর বয়সের একটি বালককে—তার প্রথম সন্তান, মাতৃত্বের গর্ব মোনাদিরকে। আজহার, আমজাদ, নঈমা সবাই মোনাদিরকে আপন করে নেয়। দরিয়া বিবির মনে এতকাল জমে থাকা কষ্টের ভার নামতে শুরু করে। তিন বছরের শিশুকে একা ফেলে এসে জননীর যে দায়িত্ব দরিয়া বিবি এতদিন পালন করতে পারেনি, সে মাতৃরূপে কোথাও যেন আজ খুঁত না থাকে সারাক্ষণ সে চেষ্টায় থাকে। মায়ের প্রতি যে নির্ভরতা ও বিশ্বাস নিয়ে মোনাদির আশ্রয় নিয়েছে তা যেন এক চুল পরিমাণ নষ্ট না হয়। সবকিছুকে ছাপিয়ে মোনাদিরের প্রতি দায়িত্বকে দরিয়া বিবি বড় করে দেখে। কষ্ট যার নিত্য সঙ্গী, তার জীবনে সুখ, আনন্দ থাকবে কেন! আজহারের প্রহারে রাগ করে মোনাদির একদিন চলে যায় অজানার উদ্দেশে। শুরু হয় আজহার ও দরিয়া বিবির সম্পর্কের টানাপড়েন। এরূপ মানসিক দূরত্বের কারণে আজহার চলে যায় না ফেরার দেশে। নেমে আসে দরিয়া বিবির জীবনে দুর্যোগ। তিনটি শিশুপুত্র এবং মোনাদিরের চিন্তা, সংসারের দায়ভাগ দরিয়া বিবিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। একান্ত বাধ্য হয়ে অর্থের জন্য নির্ভর করে ইয়াকুবের উপর। এক জননীর দুঃখ আরেক জননী ছাড়া আর কে বুঝতে পারে। আর সে জননী যদি হয় দুঃখী, অভাবগ্রস্ত। সন্তানের মর্মজ্বালা শুধু তাদেরই বোধগম্য। দরিয়া বিবির দুঃখে সাহায্য করেছিল আরেক জননী শৈরমী। শৈরমীর দুঃখেও সমব্যথী ছিল দরিয়া বিবি। পঙ্গু সন্তানকে নিয়ে শৈরমীর কষ্টের জীবন দরিয়া বিবি উপলব্ধি করতে পারত। শৈরমীর সন্তানটি মারা গেলে শৈরমীর জন্য দরিয়া বিবি স্বস্তি অনুভব করে। নিতান্তই কষ্টের জীবন-যাপনের সমাপ্তি হয় এক সময় শৈরমীর। দরিয়া বিবি মৃত্যুর মুহূর্তে কাছ থেকে দেখেছে শৈরমীর কষ্ট। তাই নিজের সন্তান শরীফন ওরফে শরী নামের মধ্যে শৈরমীর স্মৃতি তার মধ্যে জাগরূক থাকে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে —

> সেই দীন-জীবনের করুণ অবসান মুহূর্ত! ডাক নামে শৈরমীর স্মৃতি বাঁচিয়া থাক। দেশের বিশাল মানচিত্রের এক কোণে নামহীন গ্রাম্য জননীর দীন-প্রচেষ্টা — জাতি-ধর্ম যেখানে মানবতার উপর নৈরাজ্যের কোনো কণা মেলিতে পারে না। (শওকত, ১৪০৫ : ১৪৩)

ধর্মীয় সংস্কার পৃথিবীতে তাকে অপরিচিত করে রাখে। সাকের আর আমিরন চাচির বাড়ি ছাড়া আর কোথাও তার যাতায়াত ছিল না। যে সংসারে বিধবা আমিরন চাচির সন্তান আম্বিয়াকে নিয়ে সংগ্রামের জীবন, যেখানে হাসু বৌয়ের মাতৃত্বহীন কষ্টের জীবন সেখানে দরিয়া বিবি কতটুকু নির্ভর করতে পারে। তার উপর এসে ভর করে মোনাদিরের পড়ার খরচ। প্রথমে মাসিক পাঁচ টাকা, পরে পনের টাকা। সংসারে তিনটি শিশুর মুখের খাবার জোগাতে হিমশিম খেতে হয়, সেখানে মোনাদিরের জন্য নগদ অর্থ জোগাড় করার সামর্থ্য দরিয়া বিবির কোথায়? অর্থের জন্য বাধ্য হয়ে নির্ভরশীল হতে হয় ইয়াকুবের ওপর। একজন জননীর মাতৃরূপ উপলব্ধি করার মানসিকতা স্বার্থান্বেষী, লম্পট, চালাক ইয়াকুবের কোথায়! যে জননী ছোটবেলায় মোনাদিরকে মাতৃস্নেহ দিতে পারেনি, যে মোনাদির লেখাপড়ার জন্য মায়ের উপর নির্ভর করতে চায়, তাকে সন্তানবৎসল জননী নিরাশ করে কিভাবে! দরিয়া বিবির আত্মবিশ্বাস ক্রমশ অন্তর্হিত হয়। দরিয়া বিবি সমর্পণ করতে বাধ্য হয় ইয়াকুবের কাছে। ঔপন্যাসিক বলেছেন 'হন্তারক দুপুর'। এই আত্মসমর্পণের পেছনে

দরিয়া বিবির প্রশ্রয় ছিল কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে। সেদিন দুপুরে ঘুমের ঘোরে আচমকা ইয়াকুব দরিয়া বিবিকে আলিঙ্গন করে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় দরিয়া তেমন কোন প্রতিবাদ ছাড়া সমর্পণ করে নিজেকে। বা সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। " ইয়াকুবের দানে ও ঋণে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে দরিয়া বিবি। এ ঋণ থেকে মুক্তির দায় অনুভব করে দরিয়া বিবি। তার চরিত্রের সমস্ত দৃঢ়তা, পবিত্রতা খেয়ে ফেলে ইয়াকুবের ঋণ।" (আহমেদ, ২০০১ : ২৯৯) সন্তানের জন্য দরিয়া বিবি এ ঋণ বিনা বাক্যে গ্রহণ করে। ভেতরে কষ্ট দুমরে মুচড়ে ওঠে। তবুও নিজে বেঁচে থাকতে সন্তানকে সহায়হীন অবস্থায় পড়তে দিতে চায় না। এ মুহূর্তে তার প্রয়োজন মোনাদিরের জন্য নগদ অর্থ। তার চারপাশের পরিচিত, আন্তরিক সম্পর্কের কারোরই আর্থিক সহায়তা করার মতো সচ্ছলতা নেই। তাই সে ইয়াকুব এবং তার ঘৃণ্য অত্যাচারকে নীরবে সহ্য করে নেয়। এ যেন *পদ্মানদীর মাঝির* কুবেরের অবস্থা হোসেন মিয়ার কাছে। প্রচলিত সমাজে হয়তো দরিয়া বিবির চরিত্রে সতীত্বের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে না। ইয়াকুবের সাথে দৈহিক সম্পর্কের পর দরিয়া বিবির সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। প্রচলিত সমাজের নিয়মানুসারে সতী নারীর গর্ব এ সমাজে দরিয়া বিবি কখনোই করতে পাররে না। সমাজ তাকে তা করতে দেবে না। সমাজ তার জীবনকে করে তুলবে বিষাক্ত।

> এই ঘটনার পর আমি কোন ভাবেই জননী দরিয়াবিবিকে সতী বলতে পারি না (অবশ্য প্রথাগত সামাজিক অর্থে)। প্রচলিত অর্থে নারী সতীত্বের যে ধারণা আমাদের মনে কাজ করে, আমি সেই মূল্যবোধকে স্বীকার করি না। উপরে 'সতী বলতে পারি না' কথাটি বলেছি উপন্যাসের বিধৃত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। আমি দরিয়াবিবির পক্ষে দাঁড়িয়ে বলবো দরিয়া নিজেকে বঞ্চিত করেনি, জীবনকে উপেক্ষা করেনি। জীবনকে বাঁচাতে, জীবনের পক্ষে দাঁড়িয়ে, শরীর ও মনের তাগিদে ইয়াকুবের সঙ্গ ও সঙ্গমকে গ্রহণ করেছে। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। লক্ষণীয় তখন দরিয়াবিবি ছিল স্বামীহারা, বিধবা। শরীর ও মনের দিক থেকে সে ছিল উপবাসী। সহায়-সম্বলহীন এই বৈধব্য জীবনে দরিয়া-বিবিকে শুধু অর্থাভাব ও অন্নাভাব দিয়ে বিচার করলে তার প্রতি অবিচারই করা হবে। (আহমেদ, ২০০১ : ২৯৯-৩০০)

সমালোচকের এ মন্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত হওয়া সম্ভব নয়। সমাজ কিছু প্রচলিত নিয়মে বাঁধা। এর বাহিরে সমাজ যেতে চায় না। যুগ যুগ ধরে পুরুষশাসিত সমাজে সতী শব্দটি শুধুমাত্র নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। তাই হয়তো দরিয়া বিবিকে সতী নারীর মর্যাদা দিতে চাইবে না সমাজ। কিন্তু দরিয়া বিবি যে অবস্থা ও অবস্থানে থেকে ইয়াকুবের লালসার কাছে পরাভূত হয়েছে সেখানে তার মন ও শরীরের চাহিদার কোনো সম্পর্ক ছিল না। দরিয়া বিবি তাকে জোরালোভাবে বাধা দেয়নি মোনাদিরের নগদ অর্থের প্রয়োজনে। উপন্যাসে দরিয়া বিবি এমন কোনো ইঙ্গিত ইয়াকুবকে দেয়নি যা প্রমাণ করে দরিয়ার মনের ও শরীরের চাহিদার সীমানাকে। বরং মাতৃরূপী নারীর জননীসত্তার বিকাশ লক্ষ করা যায়। যে মুহূর্তে মোনাদির টাকা নিতে অপরাগতা প্রকাশ করে সেদিন থেকে দরিয়াবিবি ইয়াকুবের অর্থ নেয়া বন্ধ করে দেয়। তার মাতৃরূপ ছাপিয়ে ব্যক্তিগত চাহিদা গুরুত্ব পেলে ইয়াকুবকে বশীভূত করে রাখা দরিয়া বিবির জন্য কঠিন কোনো বিষয় ছিল না। তার তিনটি

সন্তান রয়েছে কাছে, আরেকটিকে গর্ভে ধারণ করে আছে। তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করলেও ইয়াকুবের সান্নিধ্যকে দরিয়াবিবি উপভোগ করত। দরিয়া বিবি যা কিছু করেছে সন্তানের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য করেছে। এর চেয়ে বেশি জননীর মাতৃরূপ আর কী হতে পারে! ইয়াকুবের অবৈধ (সামাজিক প্রথানুযায়ী) সন্তানকে ইচ্ছে করলে দরিয়া বিবি গর্ভেই মেরে ফেলতে পারত। অথবা সন্তানসহ আত্মহত্যা করতে পারত। একটি নিষ্পাপ শিশুকে জগতের আলো থেকে বঞ্চিত করার বাসনা কোনো মায়েরই থাকে না। বিশেষ করে দরিয়া বিবির মতো জননীর। সন্তানকে পৃথিবীর আলোতে এনে (কে জানে হয়তো বা মনের গহীনে হাসু বৌয়ের সন্তানের জন্য যে বুভুক্ষুরূপ তা জেগে ছিল) নিজের জীবনের ইতি টেনেছে। জননী হিসেবে এটি দরিয়া বিবির সাহসী পদক্ষেপ। "প্রতিকূল পরিবার ও সামাজিক পটভূমিতে দরিয়া বিবির অস্তিত্ব সংগ্রামের নির্মম বাস্তবতা নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন ঔপন্যাসিক। মানবত্বের অন্তর্সত্যই এ-উপন্যাসের মৌল উপজীব্য।" (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ৩০)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শওকত ওসমান তাঁদের উপন্যাসে নারীর মাতৃরূপকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন সত্যেন সেনের দৃষ্টিকোণ তা থেকে একটু ভিন্ন। ভিন্ন এই অর্থে যে, শ্যামা ও দরিয়া বিবি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দুই জননী। অভাবের সাথে সংগ্রাম করে করে সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে বর্তমান সত্যেন সেনের উপন্যাস তা থেকে অনেকটা ব্যতিক্রম। বেঁচে থাকা আর শুধু খাওয়া পড়ার সংগ্রাম এ উপন্যাসের মৌল উপজীব্য নয়। *মা* উপন্যাসে সত্যেন সেন তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বিশেষ করে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলে শ্রমিক আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। কার্ল মার্কসের জীবনবোধ সত্যেন সেনকে আলোড়িত করে। তারই পটভূমিতে রচিত *মা* উপন্যাসটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি দিলে উপলব্ধ হবে যে, "১৯০৫ খ্রী. থেকে ১৯৩০ খ্রী. পর্যন্ত এই পঁচিশ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাঙলার বুকে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল।" (নরহরি, ১৯৯৯ : ১৯৮) বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত সমিতির সংগঠনগুলো ছিল মজবুত। কংগ্রেস নেতাদের আপসপন্থি কর্মসূচির তারা তীব্র বিরোধিতা করেছিল। তারা অসহযোগসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনে যোগ দিতেন। অসহযোগের ব্যর্থতায় তাদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার অনেক সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসমালোচনা আরম্ভ হয়। রুশ বিপ্লব সে সময় পার্টির অনেকের মনে বিশ্বাসের বীজ সৃষ্টি করে। কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ দ্বারা অনেকেই প্রভাবিত হয়।

> ঠিক এই সময়েই তারা একটি নতুন আদর্শের সন্ধান পেলেন। ১৯১৭ খ্রী. রুশ বিপ্লব এবং যুদ্ধোত্তর যুগে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রুশ দেশের জয়যাত্রা তাদের অনেকের মনে গভীর বিশ্বাস উৎপাদন করল। এই সময়ে তাঁরা সাগ্রহে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল ও সোভিয়েত গভর্মেন্ট প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। দেশের মধ্যেও ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হল। (নরহরি, ১৯৯৯ : ২০১)

এ রকম পটভূমি ও পরিবেশকে ধারণ করে প্রগতিশীল চিন্তার রূপকে অসীমা উপন্যাসের মূল চরিত্র হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শুরুতে নিজ সন্তান বিভুর মা পরিচয়ের পাশাপাশি অসীমার আরেকটি মানবিক রূপের পরিচয় পাই। তিনি বিভুর বন্ধু মাতৃহীন প্রবালেরও মা। মায়ের ভালোবাসা, দায়িত্ব, কর্তব্য পালনের কোনটাতেই তিনি দুজনকে আলাদা করে দেখেননি। মায়ের শাশ্বতরূপ অসীমার মধ্যে পরিস্ফুট। পর্যায়ক্রমে অসীমার পরিচয়ে জানা যায়, তিনি মৌখালী গ্রামের যদু ডাক্তার, পলাতক বিপ্লবী নরেন রায়ের কন্যা। রক্তে যার বিপ্লবী নেশা, দেশ গড়ার চিন্তা, সেই বিপ্লবী নারী দেশ গঠনের হাতিয়ার হয়ে উঠবে এটাই তো স্বাভাবিক। বিভু, প্রবাল, বীথি, রামু, মা এরা সবাই বিপ্লবী দলের কর্মী ও সমর্থক। বিভু, প্রবাল ও বীথি বিপ্লবীদলের সক্রিয় কর্মী। প্রবাল তিন বছর জেল খেটে বেরিয়ে আসার পর শুরু হয় মতাদর্শের বিরোধ। প্রথম বিরোধ বাধে বন্ধু বিভুর সঙ্গে। বিভু দৃঢ়তার সাথে বলেছিল — "আমি ঘর ছাড়তে পারি কিন্তু আমার আদর্শ যে ছাড়তে পারি না।" (সত্যেন, ২০০৬ : ১৩) প্রবাল তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল যে, আদর্শ কোনো স্থাবর পদার্থ নয় যে তা পরিবর্তন করা যাবে না। যে ঘরের ভিত্তি ক্ষয়ে গেছে তা ভেঙে পড়বেই। এক সময় বিপ্লবী দলের আদর্শ ছিল সময়োপযোগী। আজ পৃথিবী মানুষের কথা বলছে। খেটে খাওয়া, নিরন্ন মানুষের কথা। আজ সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করার সময় এসেছে। কোনো কিছুর মোহে প্রবাল দলের আদর্শ বিসর্জন দেয়নি। প্রবালের যুক্তি — "আমি কালজীর্ণ পুরানো আদর্শকে ত্যাগ করে নতুন আদর্শকে গ্রহণ করতে চলেছি। অন্ধে নীয়মান অন্ধের মতো নয়, আমি আমার নিজস্ব বুদ্ধি আর যুক্তির আলোক হাতে নিয়ে পথ চলতে চাই।" (সত্যেন, ২০০৬ : ১৩) জেলখানার তিনটা বছর তাকে ভেঙে-চুরে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ করে দিয়েছে। রাজবন্দি অবস্থায় প্রচুর বই ছিল প্রবালের সঙ্গী। বই প্রবালের চিন্তা-চেতনার দ্বার নতুন করে খুলে দিয়েছিল। নিজস্ব উপলব্ধি থেকে বিপ্লবী দল সম্পর্কে প্রবাল অভিমত ব্যক্ত করে — "এ যুগের স্বাধীনতা আন্দোলন বল বা বিপ্লবী আন্দোলন বল তাকে পরিচালনা করবার যোগ্যতা এদের কই।" (সত্যেন, ২০০৬ : ১৪) প্রবাল বহিষ্কৃত হয় পার্টি থেকে। পার্টি তাকে একঘরে করে দেয়ার ঘোষণা দেয়। প্রবাল আশ্রয় নেয় এক বস্তিতে। নিম্ন শ্রেণির মানুষ হয়ে ওঠে তার সহচর। যখন বিভু, বীথি, পার্টি, সমাজ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং তাকে প্রতি পদে পদে বাধার সৃষ্টি করেছিল, সে সময় প্রবালের পাশে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়েছিল মা। বিভুর জন্মদাত্রী মা অসীমা। এক সময় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকা, বিভুর বিপ্লবী পার্টিতে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণাদাত্রী মা, প্রবালকে মাতৃস্নেহে সিঞ্চিতকারী মা আজ নিজ সন্তান বিভুর রাজনৈতিক মতাদর্শকে অতিক্রম করে প্রবালের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে সন্তানবৎসল মারূপে, পরবর্তীকালে প্রবালের চিন্তাধারার একজন অনুষঙ্গী হিসেবে। পরে শ্রমিকশ্রেণির মা-রূপে আত্মপ্রকাশ করে অসীমা। একজন মা যে শতধারায় উৎসারিত হতে পারে সত্যেন সেন *মা* উপন্যাসে অসীমা চরিত্রে তার প্রতিফলন দেখিয়েছেন। একজন নারী; সমাজ বদলের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, নিজ সন্তানের পাশাপাশি অবহেলিত, বঞ্চিতদের মা হয়ে উঠতে পারার গৌরব বহন করতে পারে। নারী শক্তিশালী, নারী প্রগতিশীল চিন্তার ধারক, নারীর মাতৃত্ব দুঃসময়ে সন্তানের পাশে কখনো কোমলরূপে, কখনো ভীষণ মূর্তিতে অবস্থান নিতে পারে। নজরুল বলেছেন —

আজ . জাগৃহি মা, আজ জাগৃহি মা
তব চরণাবলুণ্ঠিত মহিষ- অসুর,
হ'ল ধ্বংস অসুর, লীন্ শক্তি পশুর।
তবে সম্বর রণ, হোক ক্ষান্ত রোদন —
হাক সত্য-বোধন আজ মুক্তি বোধন!
এসো শুদ্ধ মাতা এই কাল শ্মশানে
আজ প্রলয়-শেষে এই রণাবসানে!
জাগো জাগো মানব-মাতা দেবী নারী!
আনো হৈমঝারি, আনো শান্তি-বারি!
(নজরুল, ১৯৮৩ : ৭১)

মা যোগ দেয় শ্রমিক আন্দোলনে, সঙ্গে সহযোগী রামপেয়ার। মা প্রবালকে সহযোগিতার জন্য চলে যায় বস্তিতে, বিভিন্ন গ্রামে। পার্টির লোকজন নেপথ্যে আক্রমণ করে প্রবাল ও তার শ্রমিকদের উপর। পার্টির ভেতর কারো কারো মনে সংশয় দেখা দেয়। পার্টির সদস্য প্রণবের মনে সংশয় দেখা দেয়। ভাবে যে, বিপ্লব তো অনেক বড় জিনিস, কিন্তু বিপ্লব যারা করে তাদের মন এমন সংকীর্ণ, এমন খণ্ডিত কেন? শুরু হয় পার্টির ভেতরে ভেতরে ভাঙন ও দ্বন্দ্ব। অসীমা, বীথি, সুলতা সবার মনে পার্টির ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

> উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ সব চরিত্রই তাদের অভ্যন্তরে লালন করছে দ্বন্দ্ব। উপন্যাসে মা চরিত্রটির দ্বন্দ্ব দ্বিমাত্রিক। একদিকে সন্তান বাৎসল্য, অন্যদিকে রাজনৈতিক আদর্শ — এই দুই দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে চরিত্রটির মধ্যে 'সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির মনোগত দ্বন্দ্বও লক্ষ করা যায়। জনগণ-সংশ্লিষ্ট এবং জনগণ-বিশ্লিষ্ট রাজনীতির দ্বন্দ্ব তার মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকায় অবশেষে তিনি বেছে নেন জনগণ-সংশ্লিষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি। (কুদরত, ২০১৩ : ২৩৯)

নতুনের আহ্বান, নতুনের জোয়ারে সৃষ্ট ভাঙনকে রোধ করার সাধ্য নেই। শুরু হয় শ্রমিক আন্দোলন। শ্রেণি সংগ্রামের যথার্থ তাৎপর্য না বুঝেও প্রবাল, মোবারকদের সাথে শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকরা জড়ো হতে থাকে। জাতীয় আন্দোলনের শ্লোগান থেকে তৈরি হয় শ্রমিকদের শ্লোগান। "দুনিয়ার শ্রমিক — এক হও, শ্রমিক কৃষক ভাই ভাই, মিল মালিকের জুলুম চলবে না, আমাদের দাবি মানতে হবে।" (সত্যেন, ২০০৬ : ৫৫) মানুষকে ভালোবাসা মানে দেশকে ভালোবাসা। এ বোধ আজ নতুন করে জাগাতে হবে। আমাদের চিন্তার জগৎ নতুন করে গড়তে হবে। নতুনের আন্দোলনে প্রবালদের পাশে মা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। একজন নারী, চিরপরিচিত সংসারের নিয়ম, স্বামী-পুত্র-ভাইদের অনুসরণে না চলে নারীর স্বাধীন চিন্তার উপলব্ধি থেকে যে অগ্রসর হতে পারে তার জ্বলন্ত প্রতীক মা। নারীর মানুষ হিসেবে মর্যাদা অর্জনের রূপকার মা অসীমা। সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মা সম্পৃক্ত থাকে আন্দোলনের সাথে। "আন্দোলনের একটা বিশেষ ধর্ম এই যে, অনেক সময় প্রয়োজনের তাগিদে সাধারণ কর্মীদের মধ্যেও নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি গজিয়ে উঠে।" (সত্যেন, ২০০৬ : ৯১) মায়ের উপলব্ধি দেশকে ভালোবাসতে হলে

সাধারণ মানুষকে ভালোবাসতে হবে। পার্টি শুধু দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে, সাধারণ মানুষকে নয়। "দেশসেবার নামে কতিপয় নেতার ব্যক্তি-ঈর্ষা ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রচণ্ড রকমের বিরোধী মা অসীমা। তাঁর আদর্শ দেশসেবা, মানবপ্রেম থেকেই যার উৎপত্তি।" (সৌমিত্র, ২০০৭ : ১৩৫) বিভু, বীথি, সুলতাকে ছাপিয়ে মা তার মাতৃরূপকে প্রকট করে সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে। তাদের ন্যায্য অধিকারের লড়াইয়ে। শ্রমিক আন্দোলন ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানুষ ও শহরকে। বীথিও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করে প্রবালের পাশে অর্থাৎ সাধারণ শ্রমিকের পাশে দাঁড়ায়। শুরু হয় আন্দোলনের তীব্রতা। বিভু নিশ্চল, নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মতো দেখে আন্দোলনের প্রবাহকে। সিবেন বলে — "আমাদের এ কুল ভেঙ্গে যাচ্ছে, ধসে পড়ছে, আর তার পরিবর্তে জেগে উঠছে নতুন কুল, নতুন সম্ভাবনা, নতুন ভবিষ্যৎ। কিছুতেই তাকে রোধ করা যাবে না।" (সত্যেন, ২০০৬ : ১১২) বিভুর ভেতর সিবেনের কথার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। বিভুর চোখ শুধু দেখতে পায়—

> মিছিলের মাথা এবার তাদের ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ থেকে অপরাহ্নের সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য দেখা দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে মিছিলটা ডান দিকে মোড় ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে শেষ বিকেলের এক ঝলক রোদ মিছিলের অগ্রবর্তিনী মার মুখের উপর এসে পড়ল। সেই মাতৃমূর্তি অপূর্ব এক মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। (সত্যেন, ২০০৬ : ১১২)

বিভু এ দৃশ্য দেখে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। এখানেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। একজন নারী; একজন স্ত্রী, একজন বোন, একজন মা। একজন মা সন্তানের, প্রয়োজনে অনেকের। সন্তানের মঙ্গলের জন্য (তারা যে শুধু গর্ভধারণকারী সন্তান এমন নয়) নারী কীভাবে কঠিন মূর্তি ধারণ করতে পারে, নিজ পরিবার, সন্তানের মতামতকে উপেক্ষা করতে পারে তার প্রতীক অসীমা চরিত্রটি।

শ্যামা, দরিয়া বিবি ও অসীমা চরিত্রের আলোচনায় দেখতে পাই তিন পটভূমি ও সমাজ পরিবেষ্টিত তিনটি নারী চরিত্র এবং তাদের মাতৃত্বের রূপ। তিনজনই সন্তানের জন্য নিবেদিত নারীর মহিমান্বিত রূপ; মাতৃরূপকে বিকশিত করেছেন। তাদের জীবন সংগ্রাম; সন্তানের জন্য, মাতৃত্বের জন্য সংগ্রাম। মাতৃত্ব এবং সংগ্রাম উপন্যাসত্রয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবন সংগ্রামে লিপ্ত তিনজনই বেঁচে থাকার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। তবে কেউই সন্তানকে ছাপিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করেননি। শ্যামা ও অসীমা হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং দরিয়া বিবি মুসলমান। শ্যামা ও অসীমার জীবন সংগ্রামে ধর্মের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না যা দরিয়া বিবির চরিত্রে দেখতে পাই। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সংস্কার তাকে বাইরের পরিবেশ ও পৃথিবীকে চিনতে দেয়নি। নিতান্তই অনেকটা নিজ গৃহকোণে আবদ্ধ থেকে সে সন্তানের জন্য প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করেছে। শ্যামাও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সন্তানের জন্য লড়াই করেছে। লড়াই অসীমাও করেছে। তবে তা শ্যামা ও দরিয়ার মতো অর্থ কষ্টের জন্য নয়। শ্যামার সংসারে প্রথম দিকে অনেকখানি আর্থিক সচ্ছলতা ছিল। তাছাড়া শ্যামা শহরতলির মেয়ে। কিছুটা লেখা-পড়াও জানত। শীতল ছাড়াও শ্যামার নির্ভর করার মতো

ননদ মন্দা ছিল, বুদ্ধিদাতা মামা ছিল। আর্থিক ও জৈবিক প্রয়োজনের জন্য শ্যামার স্বামী শীতল ছিল। কিন্তু সে ছিল মদ্যপ, অন্য নারীতে আসক্ত। শ্যামাকে মারধর করত। শ্যামা সন্তানকে মাতৃত্বের মমতায় বড় করে তুলেছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে। মাতৃত্বের নেপথ্যে শ্যামার মনে সন্তানের ওপর মানসিক ও আর্থিক নির্ভরতার মনোভাবকে উপেক্ষা করা যায় না। অপরদিকে দরিয়া বিবির একাধিক বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামী আজহার ধর্মীয় অনুশাসন মেনে, সৎভাবে জীবনকে চালিত করেছে। প্রথম স্বামীর সন্তান মোনাদির একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার কাছে থাকতে পারেনি। খুব অল্প সময়ের জন্য দরিয়া বিবি মোনাদিরকে পেয়েছিল। আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ী*র জয়গুন চরিত্রের সাথে এ বিষয়টির তুলনা করা যায়। জয়গুনেরও প্রথম স্বামীর সন্তান কাশেম। ছেলের দুঃসময়ে জয়গুন তার পাশে এসে দাঁড়ায়। যেমন দাঁড়িয়েছে দরিয়া বিবি। দরিয়া বিবি প্রথম সন্তান মোনাদিরের জন্য বিপুল ত্যাগ স্বীকার করেছে, এমনকি নারীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সতীত্বকে বিসর্জন পর্যন্ত দিয়েছে। বাঁচার সংগ্রামের সাথে সাথে, সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করার স্বপ্নকে কোনভাবেই উপেক্ষা করেনি দরিয়া বিবি। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' — ভারতচন্দ্রের এ অমর বাণীকে লালন করেছে গ্রামীণ, অশিক্ষিত, বিধবা দরিয়াবিবি। স্বামী যে-ই হোক যেমনই হোক, পরিবেশ, পরিস্থিতি যাই থাকুক নারীর মাতৃরূপ কখনো বদলায় না। সব সময়ে, সব সমাজে তা একই রূপে ধরা দেয়। শ্যামার দুঃসময়ে হারান ডাক্তার অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছিল। দরিয়া বিবিকে কোটাল শারীরিক শ্রম দিয়ে, মানসিকভাবে সাহায্য করলেও আর্থিক নির্ভরতা দিতে পারেনি। গ্রামীণ, অশিক্ষিত-লাঞ্ছিত দরিয়া বিবিকে জীবনের আর্থিক চাহিদার কাছে পরাভূত হতে হয়েছে। ইয়াকুবের ফাঁদে পা দিতে হয়েছে। প্রচলিত সমাজে অসতীর তকমা গায়ে চাপাতে হয়েছে।

শ্যামা শীতলের আর্থিক উপার্জনে, নিজ বুদ্ধিবলে সংসার চালিয়েছে, সন্তানের জন্য সংগ্রাম করেছে, একান্তই বিপর্যস্ত অবস্থায় শীতলের বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিতে পেরেছে। শীতলের বাড়ি ভাড়া ও বিক্রির টাকায় কিছুটা আর্থিক স্বস্তিতে থাকতে পেরেছে। দরিয়া বিবির সে রকম কোনো অবস্থা ও অবস্থান ছিল না, বিশেষ করে স্বামী আজহারের মৃত্যুর পর। দুই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে, পরিবেশে অনেক তফাৎ থাকলেও মাতৃরূপে দুজনেই সমুজ্জ্বল। সন্তানই সব সময় তাদের সব কিছুর ঊর্ধ্বে থেকেছে। এদের পাশাপাশি *মা* উপন্যাসের অসীমা চরিত্রটি ব্যতিক্রম। যে জীবন ও পরিবেশে শ্যামা ও দরিয়া বিবি সন্তানের জন্য সংগ্রাম করেছে, সে জীবন ও পরিবেশ অসীমার ছিল না। অর্থ কষ্টকে ছাপিয়ে অসীমার জীবনাচরণ ও রাজনৈতিক আদর্শের কারণে অসীমাকে স্বামীর মানসিক নির্যাতন সইতে হয়েছে। অসীমা যে ব্যক্তিত্ব, যে মানসিকতা নিয়ে প্রতিকূল পরিবেশে লড়াই করেছে, সন্তানকে তার মানসিকতার অংশীদার করতে চেয়েছে তা সাহিত্যে বিরল। ব্যক্তিকে ছাপিয়ে দেশকে বড় করে দেখার মানসিকতা অসীমা চরিত্রে দেখা যায় — যা তাকে মহিমান্বিত করেছে। নারীর যে স্বকীয় সত্তা আছে, স্বাধীনতা আছে, মুক্ত চিন্তার অধিকার আছে তার উদাহরণ অসীমা। দেশের জন্য, দেশের সাধারণ মানুষের জন্য, তাদের সন্তানসম মনে করে 'তাদের জন্য সংগ্রাম করা প্রয়োজন' এ উপলব্ধি অসীমা চরিত্রে ফুটে

ওঠে। নারী মহীয়সী, প্রেরণাদাত্রী, প্রয়োজনে আবার কঠিন মূর্তি ধারণকারী, তারই প্রতিমূর্তি অসীমা চরিত্র। অসীমা তাই জাতীয় রাজনীতির চরিত্র হয়ে উঠেছে। ম্যাক্সিম গোর্কির মায়ের সাথে সে তুলনীয়।

তিনজন নারীই সন্তানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, মমতার ফল্গুধারা ঢেলে দিয়েছে। শ্যামা, অসীমা, দরিয়া — এ তিনজনের কেউই মায়ের দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে পিছু হটেনি। বরং মায়ের দায়িত্ব পালন করতে করতে মাতৃত্বের স্বরূপে নারীর অবস্থানকে সংসারে, সমাজে নির্ভীক ও বিশ্বাসী করে তুলেছে। মানিকের *জননী* নিয়ে নিতাই বসু যে মূল্যায়ন করেছেন তা যেন উপরি-উক্ত তিন জননীর জন্যই প্রযোজ্য।

> লেখক তাঁর জননী-কল্পনায় গর্কির মতো বিপ্লবের বাণী বাহিকার মূর্তি কল্পনা করেননি। পরন্ত এই জননী যেন বসুন্ধরারই প্রতীক, সৃষ্টির উষাকাল থেকে যে মাটি তার প্রাণরস সঞ্জীবনী সুধা দিয়ে মানব সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখেছে প্রকৃতির আদিম হিংস্র ভয়াল আক্রমণের হাত থেকে। (নিতাই, ১৯৭৮ : ১২১-১২২)

শ্যামা সন্তানবাৎসল্য, বুদ্ধিমত্তা ও গৃহিণীপনায় নিপুণা এবং কর্মঠ। দরিয়া বিবি চরিত্রটিও ইস্পাতকঠিন, আত্মসম্মানবোধ ও সুনিপুণ গৃহিণীপনা ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতাসম্পন্ন। পাশাপাশি অসীমা চরিত্রও ইস্পাতকঠিন, আত্মসম্মান ও স্বকীয় চিন্তার অধিকারী। সন্তানবাৎসল্যের মতো গুণাবলির সমন্বয় দেখা যায় তার চরিত্রে। শ্যামা সুবর্ণের মা হবার গৌরবের ভেতর নিজের মাতৃত্বকে নতুন করে ফিরে পায়। দরিয়া বিবি সন্তানকে পৃথিবীর আলোতে এনে নিজে আত্মাহুতি দেয়। জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে মাতৃত্বই মুখ্য থাকে। অসীমা পারিবারিক গৃহকোণ থেকে দেশময় তার মাতৃত্বের স্বরূপকে ছড়িয়ে দিয়েছে। মিল-অমিলের বাইরে এ তিন নারী চরিত্রের যে দিকটি পাঠককে আকৃষ্ট, মুগ্ধ, বিমোহিত করে তা তাদের মাতৃরূপ। শ্যামা, অসীমা, দরিয়া বিবি তাদের চরিত্রে যে অনুভবকে সব সময় লালন করেছেন তা তাদের মাতৃত্বের মহিমা এবং তার জন্য তাদের অবিরত সংগ্রামশীলতা। নারীর মাতৃরূপ অঙ্কনে তিনজন ঔপন্যাসিকই সফলতার দাবিদার।

মূল গ্রন্থ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৫)। *জননী*, অঙ্কুর পুস্তকালয়, কলকাতা।
শওকত ওসমান (১৪০৫)। *জননী*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
সত্যেন সেন (২০০৬)। *মা*, সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ মাওলা (২০০১)। "জননী : মানিক ও শওকত", *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূইয়া ইকবাল সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৮৩)। *নজরুল রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
কুদরত-ই-হুদা (২০১৩)। *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস : আঙ্গিক বিচার*, আদর্শ, ঢাকা।
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (২০০৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নরহরি কবিরাজ (১৯৯৯)। *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা*, মনীষা, কলকাতা।

নিতাই বসু (১৯৭৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-জিজ্ঞাসা*, পরিবেশক : দে বুক ষ্টোর, কলকাতা।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শওকত ওসমান (১৯৬১)। *জননী*, ঢাকা বুকস্, ঢাকা।

সরকার আবদুল মান্নান (২০০৩)। *উপন্যাসে তমস্যাবৃত জীবন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সরোজমোহন মিত্র (২০০৯)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সিদ্দিকা মাহমুদা (২০০৮)। "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যামা চরিত", *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক (২০০৬)। *জীবনানন্দের শুভ অশুভের দ্বন্দ্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ*, ঐতিহ্য, ঢাকা।

সৌমিত্র শেখর (২০০৭)। *সত্যেন সেনের উপন্যাসে জীবন ও শিল্পের মিথস্ক্রিয়া*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।